Vol. 11 | No. 1 | 1967

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

The Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengal (up to 1855 A.D.)

Volume	11
Issue	1
Year	1967
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Dr. Qazi Abdul Mannan
Published online	June 15, 1967
DOI	10.62328/sp.v11i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v11i1.6
Pages	125-222
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গ্রন্থ-পরিচয়

Check for updates

The Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengal (upto 1855 A.D.) : Dr. Qazi Abdul Mannan. Dept. of Bengali & Sanskrit, University of Dacca, pp 273. Rs 8.00

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ যেখানে শেষ হ'ল সেইখানেই কিন্তু আধুনিক যুগ শুরু হ'লনা—ঐ শেষ ও শুরুর মাঝখানে রয়েছে প্রায় একশো বছরের ব্যবধান। কিন্তু সাধারণ নিয়মে তো এমনটি হওয়ার কথা নয়। কেননা সাহিত্য কখনো জীব-জন্মের নিয়মাবলী মেনে চলেনা, এবং একটা বিবর্তনের সূত্র ধ'রে ক্রমে ক্রমে নানা বিপরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সাহিত্য লাভ করেছে তার আধুনিকতা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা স্বাভাবিক বিবর্তনের ফল নয়। কোনো অবস্থাতেই একথা সত্য নয় যে ভারতচন্দ্রের পর কবিওয়ালাগণের এবং গুপ্ত কবির সাহিত্য-সাধনার স্বাভাবিক বিবর্তন-ধারায় মাইকেলের আবির্ভাব হয়েছে। এক কথায় বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের যেমন কোনো উত্তরাধিকারী নেই, তেমনি মাইকেলের নেই কোনো পূর্বসূরী। মাঝখানে কবিওয়ালারা তবে কী? ঠিক অনুরূপ প্রশ্নই ওঠানো চলে মুসলমান দোভাষী পুথি-লেখকদের সম্পর্কেও। মধ্যযুগের আলাওল, দৌলত কাজী প্রমুখ শক্তিশালী মুসলমান কবি দোভাষী পুথি লেখেননি; একালের প্রথম মুসলমান কবি কায়কোবাদও দোভাষী পুথির মধ্যে আত্মপ্রকাশের কথা ভাবেননি। অথচ মাঝখানে একশ্রেণীর মুসলিম লেখক দোভাষী পুথি রচনা করেছেন—কবিওয়ালাদের গানের মতো মুসলিম সমাজে তা জনপ্রিয়ও হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা যেমন দোভাষী পুথির বিবর্তিত রূপ নয়, তেমনি আলাওল দৌলত কাজী প্রভৃতি কবিদের রচনায় দোভাষী-পুথির ভাষার কোনো দূরতম পূর্বাভাসও লক্ষ্য করা যাবেনা। দোভাষী তবে কী? কেন এবং কেমন ক'রে তার উদ্ভব? এই প্রশ্নেরই সুষ্ঠু মীমাংসা করেছেন ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান তাঁর The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal গ্রন্থে। দোভাষী পুথি সম্পর্কে এটি একখানি সার্থক গবেষণা গ্রন্থ।

ডক্টর মান্নানের পূর্বে দোভাষী পুথি সম্পর্কে আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, আহসানউল্লাহ, আব্দুল হাকিম, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন প্রমুখ অনেকেই সংক্ষিপ্ত এবং, অনেক ক্ষেত্রে, বিক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। কিন্তু দোভাষী-পুথির ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে কেউ বিজ্ঞান-ভিত্তিক ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেননি। ডঃ মান্নানই সর্বপ্রথম এসম্পর্কে একখানি প্রামাণ্য সুবিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করলেন। আদমউদ্দীন আহমদ একবার ১৩৫১ বঙ্গাব্দে মাসিক মোহাম্মদীতে এই দোভাষী পুথির একখানি ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তা কয়েকখানি পুথি সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত আলোচনার একত্র-গ্রথিত সমন্বয় মাত্র হয়ে উঠেছিল এবং দোভাষী পুথির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাটিকে আমরা পাইনে সেখানে। ডঃ মান্নান তাঁর পূর্ববর্তীদের উল্লেখ-যোগ্য মতামতগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন এবং তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এই মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থখানিতে।

১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত Emergence & Development of Dobhasi Literature প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) মুসলমান অধিকারের পর থেকে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের বিশেষ অবদান। (১ম ও ২য় অধ্যায়)।

(খ) দোভাষীর সূচনা এবং উক্ত সাহিত্যের বিকাশ ও বিস্তার এবং তার স্বরূপ ও মূল্যায়ন (তৃতীয় অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায়)।

(গ) দোভাষী পুথির উদ্ভব ও বিকাশের কারণ অনুসন্ধান—সামাজিক, ধর্মীয় রাজনৈতিক কারণগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

দোভাষী সাহিত্যের কলেবর যেমন বিশাল তেমনি এ-ভাষার প্রকৃতিও জটিল। কাজেই এর একটি সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত ইতিহাস রচনা করা নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ। ডঃ মান্নান সেটি করতে পেরেছেন। গ্রন্থের মধ্যে তাঁর গভীর জ্ঞান, প্রচুর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম এবং দুর্লভ বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যের রূপটিকে তিনি তুলে ধরেছেন। কয়েকটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি মধ্যযুগের কাব্যধারায় মুসলমান কবিদের সাহিত্য সাধনার স্বরূপটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন

তা দেখে চমৎকৃত হ'তে হয়। দোভাষী পুথির ভাষা ও সাহিত্য বিশ্লেষণের পটভূমি হিসেবে এর প্রয়োজনীতা অবশ্য স্বীকার্য।

মুসলমান-অধিকারের সূচনা থেকে আরবী ফারসী এবং কিছু পরবর্তীকালে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষাকে কিভাবে কতটা প্রভাবান্বিত করেছে, বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে ভাষা-সমস্যা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালের গোড়ার দিক পর্যন্ত কিভাবে দেখা দিয়েছে এবং কোন কোন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কি কি সম্ভাব্য পরিণতি ঘটতে পারে তা তিনি যত্নের সঙ্গে বহু দুর্লভ তথ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

১২০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মুসলমানেরা বাংলা দেশ জয় করার পর ক্রমেই এদেশ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আবাসভূমি হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের মাধ্যমেই এদেশে আরবী-ফারসী-হিন্দুস্থানী ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। বাংলা তো ছিলই, তার সাথে আরবী-ফারসী প্রভৃতি ভাষার শব্দ ও কয়েকটি বাচনভঙ্গি এসে মিলল। ফারসী-হিন্দুস্থানী ভাষায় অভ্যস্ত মুসলমানেরা এদেশে বাস করতে করতে ক্রমে বাংলা ভাষাভাষী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তাদের বাংলায় শব্দ-সম্ভারে ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যে ঐ বহিরাগত ভাষাসমূহের প্রভাব যে বেশী ছিল সে তো বলাই বাহুল্য। তবে দোভাষী রীতি বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা কখনোই মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের মুখের ভাষা ছিলনা। ডঃ মান্নান দেখিয়েছেন, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে আরবী-ফারসী থেকে কেবলি বিশেষ্য পদগুলি বাংলায় প্রবেশ লাভ করতে থাকে, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন ঐ সাথে হিন্দুস্থানী ভাষার ক্রিয়া-সর্বনাম প্রভৃতিও এসে ভিড় করল, তখন আর সে ভাষার সাথে সাধারণ মুসলমানের মুখের ভাষার কোনোই যোগ রইলনা; এবং দোভাষী বাংলা বলতে আজ যাকে আমরা চিনি তার রূপ ঐ সময়ই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে যে, এই দোভাষী-রীতি চালু করার পেছনে প্রথম চেষ্টাটা এসেছিল হিন্দুদের তরফ থেকেই। কোনো মুসলমানই প্রথমে আরবী-ফারসী-হিন্দুস্তানী মেশানো, ভারতচন্দ্রের ভাষায় 'যাবনী মিশাল' বাংলায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেননি। প্রথম দিকে হিন্দু কবিগণই মুসলমানী জীবনাচরণের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার তাগিদেই এই ভাষার ব্যবহার

শুরু করেন। ডঃ আব্দুল মান্নান হিন্দু লেখকগণ কর্তৃক মুসলমানী বাংলা ব্যবহারের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত অনুসরণ ক'রে নিসংশয়িত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রথম দিকে মুসলমান দোভাষী পুথি লেখক শক্তিশালী হিন্দু লেখকদের দৃষ্টান্ত দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রবন্ধ করিয়া পীর দ্বিজ কয় বাত।
তেই বড়া দাতা কুছ করত খয়রাত ॥
তিনি রোজকা ভুখা মেই খেলাও কুছ মুঝে।
হাম বহুত দোয়া করিঙ্গে শুন দাতা তুঝে ॥
দুনিয়াকা বিচ মে কোই দাতা হায় নাই।
ইহা খাতির হোগা তেরা শুনহ গোসাই ॥

কিংবা

বেসান কাফের তোম বেসোর কমজাত।
শুনরে আহামক গিদি মেরী এক বাত ॥
খাওকে জাঙ্গুলি হুয়াকে মাতালা।
এতবড়া কদুরাত দেওএ গালি গালা ॥
অভি নাই জানতে হো বড় খা গাজি পীর।
খোদায় মাদার দিয়া দুনিয়াকু জাহির ॥

এই সব উদ্ধৃতি, সহসা বিশ্বাসই হয়না যে, বাংলা সাহিত্য থেকে; এবং তা রচিত হিন্দুদের দ্বারা। প্রথমটি উদ্ধৃত হয়েছে দ্বিজ গিরিধরের 'সত্যপীরের পাঁচালী' (১৬৬৩খ্রীঃ) থেকে, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' (১৬৮৬খ্রীঃ) থেকে। তখনও ঐ সপ্তদশ শতাব্দীতে ঐ জাতীয় আরবী-ফারসী-হিন্দুস্থানী মিশ্রিত ভাষায় কোনো মুসলমান লেখকই সাহিত্য রচনার কথা কল্পনা কনের নি। মনে রাখতে হবে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ আলাওলেরও সাহিত্য চর্চার কাল; এবং আলাওল, এমনকি 'হজরতের ছেফতের বয়ান' প্রসঙ্গেও, যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে দোভাষীর কোনো চিহ্নই পড়েনি।

পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার ॥
নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই সে জ্যোতির মূলে ভুবন নির্মিলা ॥

... ...

জানিয়ো যে জমে না লইল তার নাম।
তাহার হইব নরকের মাঝে ধাম॥
পাপ পুণ্য যখনে পুছিব করতার।
আগু হইয়া করিবেক নারকী উদ্ধার॥

এখানে 'রায়মঙ্গলে'র ভাষা এবং 'হুজরতের ছেফতের বয়ানে'র ভাষা পাশা-পাশি নিলে এই কথাই কি মনে হয়না যে, মুসলমানগণ নয় হিন্দুরাই বাংলা সাহিত্যে দোভাষীর ব্যবহার-সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত ক'রে তুলছিলেন?

তাই ব'লে একমাত্র সত্য নয় যে, হিন্দুদের দ্বারা দোভাষী ব্যবহারের উদাহরণ সামনে পাওয়া মাত্রই মুসলমানেরা তা লুফে নিলেন এবং দোভাষী পুথি রচনায় মেতে উঠলেন। ভেতর থেকে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা না থাকলে কেবলি হিন্দুদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই মুসলমানেরা যে ঐ কাজে প্রবৃত্ত হতেন না, কেউই তা হ'তে পারেনা, সেকথা বলাই বাহুল্য। ডঃ মান্নান তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন, সাহিত্য রচনার ভাষা কী হবে এ নিয়ে ঐ যুগের মুসলিম চিন্তাধারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদল মনে করতেন দেশীয় ভাষা বাংলাই হবে মুসলমানদের আত্মপ্রকাশের বাহন—আলাওল-দৌলত কাজী প্রমুখ শক্তিশালী লেখকগণ এই মতের অনুসারী ছিলেন; বোঝাই যাচ্ছে দলটা অতএব ভারি ছিল। অন্য একটা দল ছিল বাংলা ভাষা বিরোধী। তাদের বিরোধের স্বরূপটা কী ছিল তা ঠিক জানা যায়না, কারণ তাদের বক্তব্যের কোনো লিখিত রূপ নেই। বিপক্ষের বক্তব্য থেকেই এদের সম্পর্কে একটা ধারণায় পৌঁছানো যায় মাত্র। যেমন,—

মুছলমানী কথা দেখি মনেহ ডরাই।
রছিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপেকি গোসাই॥

অর্থাৎ ইসলামী শাস্ত্রের কথা বাংলা ভাষায় বলতে গেলে পাছে ধর্মবিরোধী কাজ করা হয়—এই ভয়টা মুসলমানদের মধ্যে বঙ্গভাষাবিরোধী-মনোভাবের পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু ঐ ভয়ে খুব একটা কাজ হয়নি প্রথম দিকে। উপরি-উক্ত চরণদ্বয়ের পর পরই পাওয়া যাচ্ছে—

লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভত্র

অর্থাৎ লোকের উপকার করবার কামনা হেতু সেই ভয়কে কবি মনে স্থান দিচ্ছেন না। ধর্মের সঙ্গে জড়িত ব্যাপারেও কবি যখন কোনো ভয়কে মনে স্থান দিচ্ছেন না তখন ধর্ম-বহির্ভূত বিষয় নিয়ে লিখতে ব'সে কবিদের মনে ভাষা সম্পর্কিত কোনো দ্বিধাই যে থাকতনা সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কবির মনে ভাষাসম্পর্কিত এই দ্বিধা না থাকলেও কিছু কিছু সাধারণ লোকের মধ্যে সম্ভবত ছিল, এবং সেই বঙ্গ-বিরোধীদের আচরণে সময় সময় কবিচিত্ত যে বিচলিত হ'ত তাও সত্য। ষোড়শ শতাব্দের কবি আবদুল হাকিমের লেখায় পাওয়া যায়—

জে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জর্ম নিন'এ না জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা জার মসে না যুশাএ।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেপে না জাত্র॥

অত্যন্ত স্পষ্ট যে, বঙ্গভাষা বিরোধীদলটি একেবারে কিছু-না মনে করার মতো ছিলনা। তাদের বিরুদ্ধে কবির অনেকখানি আক্রোশ যে সচেতনভাবে বর্ষিত হয়েছে সেটা অকারণে নয়। ধারণা করতে পারি, এই বঙ্গভাষাবিরোধীরাই জাতির অবক্ষয় যুগে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। একটা দেহের মধ্যে রোগের বীজ উপেক্ষিতভাবে দীর্ঘকাল আত্মগোপন ক'রে থাকার পর যথাসময়ে শরীরের দুর্বলতার সুযোগ পেলেই আত্মপ্রকাশ ক'রে আপন প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। বাংলা সাহিত্য দোভাষীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গটাও ঐ ধরনের ব্যাপার। আগেই আমরা লক্ষ্য ক'রে এলাম, ধর্মীয় বিষয় বঙ্গভাষায় প্রকাশ করতে কবি ভয় পাচ্ছেন বটে তবে জনসাধারণের উপকার-বাঞ্ছায় সে ভয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন। ঐ মানসিকতা সবল কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের, সেকালের স্বাধীন জাতির সুদৃঢ় মনোবলটিকেই ওখানে প্রত্যক্ষ করা যাবে। স্বাধীন জাতির ঐ সবল মানসিকতা যতক্ষণ লোপ পায়নি ততক্ষণ সাহিত্যে দোভাষীর কোনো 'আছর' হয়নি—পরে ক্রমেই যখন নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে মুসলমানগণ দুর্বল নিস্তেজ জাতিতে পরিণত হয়েছে, ঠিক সেই পরম মাহেন্দ্রক্ষণে দোভাষী রীতি ভর করেছে মুসলমানের ঘাড়ে এবং এ জাতিকে শিক্ষা দিয়েছে—

দুনিয়ার সুখ সজ্জা রাজ্য অধিকার।
যেমন চাইএর টিপি তেমন প্রকার॥ (মেছবাহল এছলাম)

এক কথায়, মুসলমানদের এক চরম অবক্ষয় যুগের সাহিত্যের বাহন হয়েছিল এই দোভাষী রীতির বাংলা। ডঃ আবদুল মান্নান অবশ্য বলেছেন—When Garibullah, the first Muslim poet to write in Dobhasi, adopted it as the exclusive language of his poetry, it was obviously firmly established as a literary language, as was the case with Brajabuli when Govindadas composed his Vaisnava lyrics. (pp 251). কিন্তু গরিবুল্লাহ্‌র পূর্বে দোভাষী রীতি কি সত্যই 'literary language' হিসেবে 'firmly established' হয়েছিল —যেমন হয়েছিল গোবিন্দ দাসের পূর্বেই ব্রজবুলি ভাষা? আবদুল মান্নান সাহেবই দেখিয়েছেন, গরিবুল্লাহ্‌র পূর্বে দোভাষী-রীতির প্রয়োগ ছিল স্থানকালপাত্রভেদে সীমাবদ্ধ একটা ব্যাপার—সাধারণতঃ মুসলিম জীবনও পরিবেশ যেখানে আঁকতে হ'ত সেইখানেই কবিরা দোভাষী ব্যবহার করতেন, সমগ্র কাব্যে নয়। একালে যেমন বিশেষ কোনো আঞ্চলিকতা-চিহ্নিত চরিত্রকে ফুটাবার প্রয়োজনে কথাশিল্পী আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন, ব্যাপারটা ছিল অনেকখানি তেমনি। কিন্তু ব্রজ-বুলির উদ্ভব ও বাংলা সাহিত্যে তার প্রয়োগ স্বতন্ত্র ব্যাপার। তবে, গরিবুল্লাহ্‌ যে দোভাষী-রীতির আবিষ্কর্তা নন, এই রীতির সবটুকুই তিনি তাঁর পূর্ববর্তী হিন্দু কবিদের রচনার মধ্য থেকে লাভ করেছিলেন—সে বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থ পাঠের পর আর কোনোই সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। কিন্তু গরিবুল্লাহ্‌র পূর্বে দোভাষী রীতির রূপরেখা মোটামুটি হিন্দু কবিদের হাতেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এই সত্যটুকু উপলব্ধির সাথে সাথে একথাও স্মরণযোগ্য যে, গরিবুল্লাহ্‌ই এই রীতিতে একখানি পুরোপুরি কাব্য রচনা করলেন এবং তাঁর পর থেকেই এই রীতিতে সাহিত্যরচনা মুসলিম সমাজে একটা প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। 'It was clearly Garibullah's high prestige which was responsible for the acceptance of Dobhasi as an established literary diction.' (pp 251) মনে রাখতে হবে, সময়টা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ —দেশ তখন পরাধীন হয়ে গেছে। হিন্দু সমাজও তখন খুব প্রকৃতিস্থ ছিলনা, থাকা সম্ভবও ছিলনা। ওদের সমাজে তখন কবিওয়ালাদের যুগ চলছে, আর মুসলমানেরা রচনা ক'রে চলেছে দোভাষী পুথি—কোনোটাই প্রাণসচল জাতির সৃষ্টিসম্পদ ব'লে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নয়। তাই দেখা যাবে, দোভাষী পুথির

একটা বিরাট অংশে লেখকগণ সমসাময়িক জীবনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে অতীতের কল্পিত বীরত্ব-কাহিনীতে সান্ত্বনা অনুসন্ধান করছেন—একটা পঙ্গু অক্ষমের সান্ত্বনা। দোভাষী পুথির ধর্ম-কথা তথা নীতিকথা অংশটুকুও প্রাত্যহিক মন ও জীবনের অনুভব-দীপ্ত, অতএব কোনো পরম প্রাণপ্রেতীর উল্লাসে মুখরিত নয়; তা কতকগুলি কথামালার সমষ্টি মাত্র। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল দেবদেবীর কাহিনী হয়েও মানবীয় হ'তে পেরেছিল, কিন্তু এই দোভাষী পুথিগুলি মানুষের কাহিনী হয়েও মোটে মানবীয় হ'তে পারেনি।

অবশ্য মান্নান সাহেব দেখাতে চেয়েছেন, এ সাহিত্য সম্পর্কে যে অবজ্ঞা সাধারণে প্রচলিত তা যথার্থ নয়, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে অবজ্ঞাপ্রসূত। অবজ্ঞা-প্রসূত কথাটা সত্য হ'লেও এ ক্ষেত্রে বলার অবকাশ আছে যে ঐ অবজ্ঞা অযৌক্তিক নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি, ঐ দোভাষী রীতিতে সাহিত্য রচিত হয়েছিল মুসলমান-দের বিপর্যয়ের যুগে, এবং ঐ বিপর্যস্ত মানসিকতা তার সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত। অতএব মুসলমানদের নব-জাগরণের প্রভাতে একটা অবজ্ঞা যদি ঐদিকে প্রসারিত হয়ই তাতে বিস্ময়-প্রকাশ অনুচিত। তবে নিরপেক্ষ সমালোচক স্বীকার করবেন, এ সাহিত্যের দুর্বলতা যতই থাক গুণের ভাগও একেবারে শূন্য নয়। হয়ত প্রচারের আগ্রহ এবং প্রয়াস এসবে অত্যন্ত বেশী, কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে এর মধ্যেও, ক্ষীণভাবে হ'লেও, মানুষের আবেগ এবং অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, রাজ্যহারা দিশেহারা মুসলিম সম্প্রদায় তখন কিভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাদের অতীত কিংবদন্তীমূলক বীরত্ব-কাহিনীর ফাঁপা খোলসের মধ্যে সান্ত্বনার আবে হায়াত অনুসন্ধান করছিল তার পরিচয় ধারণ ক'রে আছে এই দোভাষী পুথিগুলি। প্রায় দেড়শো বছর ধ'রে শত শত কবি দোভাষী পুথির মধ্যে মধ্যযুগের প্রবর্তিত অনেকগুলি ধারাকে (Romantic, Elegiac, Diductic) অনুসরণ ক'রে কাব্য রচনা করেছেন। এদের সম্পর্কে ডঃ মান্নানের মন্তব্য হচ্ছে—Some of it, admittedly, is of a low standard, but some of it has considerable literary quality.

ডঃ মান্নান বলতে চেয়েছেন, দোভাষী-রীতি কৃত্রিম ঠিকই, কিন্তু সাহিত্যে কৃত্রিম ভাষা ব্যবহারের একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এদেশে ছিল। এদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে কৃত্রিম ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ধারাকে তিনি অনুধাবন করেছেন

এবং দোভাষীর কৃত্রিমতাকে একটি সুদীর্ঘ ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। গবেষণার ক্ষেত্রে এটি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। এতকাল দোভাষী পুথির ভাষারীতিকে একটি আকস্মিক, কার্যকারণহীন ও রহস্যজনক সৃষ্টি ব'লে মনে করার যে রীতি প্রচলিত ছিল, আশা করা যায়, এবার তার অবসান হবে। বেদের ভাষা, সংস্কৃত বা বৌদ্ধ-সংস্কৃত (Buddhist Hybrid Sanskrit) বা ব্রজবুলির উৎপত্তি ও বিকাশের যে ইতিহাস দোভাষী তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ঐ সব ভাষার মতো দোভাষীরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং সে বৈশিষ্ট্য গ'ড়ে উঠেছে তার নিজস্ব পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের মধ্যে। আর, ব্রজবুলি প্রভৃতির মতোই দোভাষী-রীতি তার যুগ-দায়িত্ব-পালন শেষ ক'রে আজ মৃত ফসিলে পরিণত হয়েছে।

দোভাষী-রীতি যেমন বিশেষ একটা কালে সীমাবদ্ধ, তেমনি তা সীমাবদ্ধ বিশেষ একটা স্থানেও। সমগ্র বাংলায়, এমনকি যেখানে মুসলমানেরা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সেখানেও এই দোভাষী-রীতিতে সাহিত্যচর্চা চালু হয়নি। কলকাতার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলাতেই কেবল দোভাষী পুথি রচয়িতাদের আবির্ভাব তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক কারণেই কলকাতা বিদেশী শাসন ও শোষণের কেন্দ্রস্থল হয়ে পড়েছিল। বিদেশী রাজশক্তির প্রথম জৌলুসও দাপট প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই। অতএব ঐ অঞ্চলের প্রত্যক্ষ অবিজ্ঞতা লব্ধ মুসলিম-মানস বাংলার অন্য অঞ্চলের তুলনায় একটু বেশী বিক্ষুব্ধ হবে এটি স্বাভাবিক ছিল। আর মুসলমানদের দোভাষী-প্রীতি যে একটি পরাধীন জাতির মানস-প্রতিক্রিয়া ও তৎসঞ্জাত বিক্ষোভ থেকে—এ সত্য আজকের দিনে আর লুকোবার উপায় নেই। এছাড়াও, বিশেষ ক'রে পশ্চিমবঙ্গেই দোভাষী রীতিতে সাহিত্যচর্চা সীমাবদ্ধ রইল কেন তার আরো কারণ আছে। মুসলিম সমাজের ভাষা-সমস্যা বিশ্লেষণ ক'রে ডঃ আবদুল মান্নান দেখিয়েছেন, সাধারণভাবে কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে তখন হিন্দুস্থানী ভাষার প্রচলন ছিল কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে চালু ছিল বাংলা-হিন্দুস্থানী মেশানো একধরনের ভাষা যাকে বলা হ'ত 'খোট্টা'। Mention needs to be mode of another dialect which was current to a limited extent in the Calcutta area. It is known as khotta...It may have developed from the attempt made by Hindustani-speakers in the cities of West Bengal to acquire a working know-

ledge of Bengali...(pp 223). এই খোট্টা-ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে দোভাষী পুথির চাহিদা ছিল। আর একথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে মুসলিম আমলের অবসানের পর কবিগণকে সাহিত্যরচনা করতে হয়েছে সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের জন্যই; তখন জনসাধারণের রুচি ও চাহিদা বহুল পরিমাণে কবিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাছাড়াও, কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের মুসলমানগণ ইংরাজ-আমলে হিন্দু-সমাজের নবজাগরণটিকে প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং প্রত্যক্ষ করছিলেন কিভাবে ঐ সমাজ মুসলমানদের থেকে পৃথক ভাষা ও সাহিত্য গ'ড়ে নিয়ে জাগবার চেষ্টা করছে। অতএব ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের মনেও এমনি একটা নিজস্ব পৃথক ভাষা ও সাহিত্য গ'ড়ে নেবার আর্তি জাগাটা অস্বাভাবিক ছিলনা। তারপর এরই সাথে যুক্ত হয়েছিল রাজনৈতিক কারণ—ওহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলন। It may well be, as some critics have suggested, that some Muslim poets were prompted to write in Dobhasi as a counterblast to the Sanskritic Bengali which the pandits were advocating. There may also be some truth in Enamul Huq's contention that the popularity of Dobhasi in certain quarters was not unconnected with the Ohabi and Faray'eji movements in Bengal. (pp 252).

ডঃ মান্নানের এই গ্রন্থখানি পাঠ করতে গিয়ে একটি মজার ব্যাপার কারো দৃষ্টি এড়াবেনা। সেটি এই যে, হিন্দুদের হাতেই দোভাষী-রীতির প্রথম প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেলেও, সত্য সত্যই এটি যখন সাহিত্যের বাহন হয়ে উঠল, তখন কিন্তু একটি হিন্দুকেও এই রীতিতে কাব্য রচনা করতে দেখিনে। এমন নয় যে, দেশ ইংরেজের হাতে চ'লে যাওয়ার ফলে হিন্দুরা রাতারাতি ইংরেজী শিক্ষায় অভ্যস্ত হয়ে মাতৃভাষা চর্চা ছেড়ে দিয়েছিল। হিন্দুরা ইংরেজি শিখতে শুরু করে মোটামুটি ১৮১৭খ্রীঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে। কিন্তু তার পরেও বহুদিন ইংরেজি এদেশে সরকারী অফিস-আদালতের ভাষা হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের সূচনাতেও বহুদিন পর্যন্ত দেশীয় ও দেশ-প্রচলিত ভাষার জন্য প্রতিকূল পরিবেশ তৈরী হয়নি। তাহ'লে দোভাষী-বিরোধী হিন্দু-মানসিকতার জন্য ইংরেজ রাজত্বই কেবল মাত্র দায়ী বলা চলে কি? তাছাড়া, ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় মুসলমানদের তো বটেই হিন্দুদেরও প্রতিদিনের ব্যবহৃত

মাতৃভাষা বাংলায় এতো বেশী আরবী ফারসী শব্দ চালু ছিল যে, মাতৃভাষা প্রেমিক হিন্দুদের ঐ সময়ের প্রায়-আরবী-ফারসী-বর্জিত বাংলা কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে বৈ কি। মনে রাখব যে, ঐ সময় বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনার প্রাথমিক চেষ্টার অনেকখানি আরবী-ফারসী-বিরোধী মনোভাব দ্বারা লাঞ্ছিত। অথচ দেশের প্রাক-পরাধীন অধ্যায়ে হিন্দুদের এই আরবী-ফারসী-বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়না। তখন মুসলমান আলাওল লিখেছেন সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা এবং হিন্দু কৃষ্ণরাম দাসের বাংলা আরবী-ফারসী-ঘেঁষা। স্বাধীন দেশের মানসিকতায় যে ঔদার্য স্বাভাবিকভাবেই থাকার কথা, তাই এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু দেশ পরাধীন হওয়ার সাথে সাথেই উভয় সম্প্রদায়ের মানসিকতাই ক্রমে সঙ্কীর্ণ হ'তে শুরু করে। সেই সঙ্কীর্ণ মানসিকতারই একটা দিক হচ্ছে মুসলমানদের দোভাষী-রীতির প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ, এবং আর একটা দিক হচ্ছে হিন্দুদের দোভাষী বর্জনের উৎকট আগ্রহ।

কিন্তু ইংরাজ আমলে দোভাষী বর্জনের উৎকৃষ্টতা হিন্দুদের যতোই থাক, এ তো আমরা এতক্ষণ বরাবরই লক্ষ্য ক'রে এলাম, ঐ দোভাষী-রীতির প্রথম প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যে হিন্দুরাই করেছিলেন। হিন্দুরা একটা মুসলমানী ভাষা-রীতিকেই শুধু গ্রহণ করেছিলেন এমন নয় মুসলমান পীরকে এবং সেই সঙ্গে মুসলমানদের সংকৃতিকেও নিজেদের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেবার উদারতাও তাদের মধ্যে সেদিন লক্ষ্য করা গিয়েছিল—কালু খাঁ গাজী, বড় খাঁ গাজী প্রভৃতি পীর সেকালের হিন্দুমানসে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এইভাবেই কয়েকজন পীর দেবতাকে কেন্দ্র ক'রে একটা সংস্কৃতি-সমন্বয়-প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল সেকালে এবং সেই মিশ্রদেবতাদের মহাত্ম্য-প্রচার উপলক্ষেই আবির্ভূত হয়েছিল দোভাষী বাংলা—Dobhasi Bangla sprang up from the mixture of two cultures—Muslim and Hindu (Preface). সিদ্ধান্তটি সাধারণের কাছে প্রথমে অপ্রত্যাশিতভাবে বিস্ময়কর মনে হ'তে পারে এবং হ'তে পারে যে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি কাটতে চাইবে না। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'লে পাঠক দেখতে পাবেন নিজের অজ্ঞাতেই কখন তিনি সম্পূর্ণরূপে আব্দুল মান্নান সাহেবের মতানুবর্তী হয়ে পড়েছেন। এটি সম্ভব হয়েছে দু'টি কারণে—প্রথমতঃ যুক্তির বলিষ্ঠতা, দ্বিতীয়তঃ তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের

বিশেষ কৌশল। ঐ কৌশলের গুণেই গ্রন্থখানি নিরস পাণ্ডিত্যের ভা[illegible] আক্রান্ত না হয়ে সরসপাঠ্যও হয়ে উঠেছে, সাধারণ পাঠকের কাছে [illegible] উপরি-পাওনা হিসেবে বিবেচিত হইবে সন্দেহ নেই।

পরিশেষে, Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal গ্রন্থ এবং তার লেখকের কৃতিত্ব সম্পর্কে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক টি, ডব্লিউ, ক্লার্ক সাহেব যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধৃত করেই আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করতে চাই। তিনি বলেছেন—Dr. Mannan brought to his researches not only a thorough and unremitting industry and a critical acumen but also a capacity for objective and impartial assessment......I hope that other scholars will be induced by the publiction of his work to follow the lead he has so ably given, and study the works of other authors against the cultural background to which they belong and see through them and their writings the ancient and complex literary tradition they have inherited. —ডঃ মান্নান তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে যে দিগন্তকে উন্মোচিত এবং উদ্ভাসিত করেছেন তাকে অনুশীলনের দায়িত্ব এখন আমাদের সকলের।

গ্রন্থের সুন্দর, শোভন ও রুচিসম্মত প্রকাশনা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

আনোয়ার পাশা